# ডোকরা শিল্প নিয়ে কিছু কথা

বেশ কিছুকাল আগে পর্যন্ত গ্রামবাংলায় একটি পরিচিত দৃশ্য নজরে পড়ত। একেবারে কাকভোরে গৃহস্থের দরজায় হাজির হতেন কয়েকজন ভবঘুরে মানুষের দল। উসকোখুসকো চেহারা, পরনে বহু ব্যবহারে জীর্ণ ময়লা কাপড়, কোটরাগত দুটি ভয়ার্ত চোখ। সদরের বাইরে থেকে হাক দিতেন তাঁরা, 'কই গো মা ঠাকরুন! ফুটো ফাটা সারাবে নাকি গো। নিয়ে এসোনা পুরোনো পেতলের বাসনকটা। বানিয়ে দিই ননীচোরা, পাই-কুনকে, মা লক্ষ্মীর ঝাঁপি।' কিছুক্ষণ পরেই উঁকি দিত একগলা ঘোমটা দেওয়া গিন্নি ঠাকুরুনের অবয়ব। ঝপঝপ করে দরজার বাইরে সংসারের ভাঙাচোরা পেতলের বাসনগুলো নামিয়ে দিয়ে নিমেশেই ঢুকে যেতেন অন্দরে। সদরের বাইরে জড়োসড়োভাবে বসে থাকা মানুষগুলো এবার পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে, জিনিসগুলো তাদের সঙ্গে থাকা ঝোলায় পুরে, হাঁটা দিতেন গ্রামের শেষ বুড়োবটের তলায়। কাঠকয়লার আগুন জ্বালিয়ে, পেতলগুলো গালিয়ে, বিচিত্র এক দেশি পদ্ধতিতে চোখের নিমেষে বানাতেন সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, ঠাকুর দেবতার মূর্তি, আরও কত কী। বেলা পড়ে এলে গৃহস্থকে সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে সামান্য পাওনাগণ্ডা নিয়ে পাড়ি দিতেন অন্য এক গাঁয়ে। গাঁয়ের মানুষের ভাষায় এই যাযাবার শিল্পীরা হলেন ডোকরা বা ঢোকরা কামার। চালচুলোহীন এই মানুষগুলোর ছায়া মাড়ানো নিষেধ। তাই গাঁয়ের একেবারে শেষ সীমানায় কদিনের জন্য অস্থায়ীভাবে আস্তানা বাঁধতেন এঁরা।

বাংলার প্রাচীন এই লোককলাটির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে প্রয়াত বিনয় ঘোষ, তারাপদ সাঁতরা আর মীরা মুখোপাধ্যায়ের লেখার সূত্র ধরে। এরপর চাক্ষুস সাক্ষাৎ ঘটে ১৯৯৫-৯৬ সাল নাগাদ বাঁকুড়া জেলার বিকনা শিল্পডাঙাতে। সে সময় এখনকার মতো ডোকরা শিল্পের এত রমরমা ছিল না। সরকারের

# ডোকরা শিল্প

বাংলার এক পরম্পরাগত লোকশিল্পকলা ডোকরা। হারানো মোমছাঁচলোপী ধাতু ঢালাই পদ্ধতিতে (lost-wax casting) এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে প্রবহমান এই অত্যাশ্চর্য শিল্পধারাটি। আজ থেকে কয়েক লক্ষ বছর আগে আগুনের আবিষ্কার মানুষের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। আগুন তার খাদ্যাভাসেই শুধু বদল আনেনি, তাকে করেছিল সৃষ্টিশীল। অন্যভাবে বলতে গেলে নব্যপ্রস্তর যুগে কৃষিভিত্তিক স্থায়ী বসতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে নান্দনিক ভাবনার উন্মেষ হয়। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানকে ব্যবহার করে দৈনন্দিন যাপিত জীবনের নানাদিককে তারা সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে শুরু করে। ঘরের দেওয়াল, মাটির বাসনে যেমন নানা চিত্রকলাকে ফুটিয়ে তোলে, তেমন ব্রতকেন্দ্রিক ধর্মাচারণে আঁকে আলপনা। ব্যবহৃত মাটির পাত্রগুলোকে স্থায়ী করতে তারা এগুলো আগুনে পুড়িয়ে নিত। দৈনন্দিন জীবনের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে মাটির পাশাপাশি ধাতুর জিনিসও ব্যবহৃত হতে শুরু হয়। প্রথমে তামা, লোহা এবং পরবর্তীতে পিতল কাঁসার মতো সংকর ধাতুর আগমন ঘটে তাদের জীবনে। এই নব্য প্রস্তর যুগের বিশেষ এক পর্বে আবিষ্কৃত হয় ধাতু ঢালাই পদ্ধতি। আমাদের দেশের সাবেকি ধাতু ঢালাই পদ্ধতির সঙ্গে ডোকরাশিল্পীদের ধাতুঢালাই পদ্ধতির বিস্তর ফারাক।

ডোকরা শিল্প-কর্ম পদ্ধতি যথেষ্ট জটিল। এর প্রতিটি স্তরে রয়েছে লোকায়ত আদিম করণকৌশল। সাধারণত ৮ থেকে ১০টি ধাপে দীর্ঘক্ষণ ধরেই এই শিল্পধারাটি হয়ে থাকে। প্রতিটি ধাপে অত্যন্ত মনোনিবেশ

ও মুন্সিয়ানার প্রয়োজন হয়, নয়তো শিল্পীর মনোমতো শিল্পকর্মটি হয় না। পাঠকদের সুবিধার জন্য সংক্ষেপে এটি তুলে ধরা হল—

১) প্রথমে উইটিবি বা নদীর তীর থেকে সংগ্রহ করা এঁটেল মাটি কাপড়ে চেলে নিয়ে, বালির সঙ্গে মিশিয়ে, পরিমাণ মতো জল দিয়ে মেখে একটা মন্ড তৈরি করেন শিল্পীরা। এই মণ্ড থেকে কাঙ্খিত শিল্পবস্তুর একটা প্রতিকৃতি বা মডেল তৈরি হয়।

২) এই মডেলটি খুব ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়।

৩) শুকিয়ে যাওয়া মাটির মডেলটির ওপরে ধুনো-পিচের তার জড়িয়ে সম্পূর্ণভাবে মুড়ে তার ওপর মোমের নকশা করেন শিল্পীরা। মোমকে নরম করে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে তার থেকে মোমের সূক্ষ্ম সুতো বা তার তৈরি হয়। যে শিল্পী যত বেশি কুশলী তিনি ততো সুন্দরভাবে এই সুতো বানিয়ে তা দিয়ে নকশা তৈরিতে পারঙ্গম হন। আদতে এই মোমের পুতুলটির ওপর ডোকরা শিল্পের গুণমান নির্ভর করে থাকে। এতে জুড়ে দেওয়া হয় পিতল যাওয়ার জন্য মোমের নালি।

৪) এরপর মোমের পুতুলটির চারদিকে দেওয়া হয় কাদামাটির বিশেষ আস্তরণ বা ছাঁচ। নদীর তলা থেকে সংগ্রহ করা মিহি কাদামাটি, গোবর, কাপড়ের কুঁচি, ছাঁকা তুষ বেশি জল দিয়ে মেখে এই ছাঁচটি বা প্রলেপটি দেওয়া হয়। এক্ষেত্রেও শিল্পীর খুব দক্ষতার পরিচয় দরকার। পিতল যাওয়ার জন্য মোমের নালির মুখটা থাকে ছাঁচের বাইরে।

৫) মাটির ছাঁচে ঢাকা মোমের পুতুলটিকে খুব ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়।

৬) এরপর শিল্পী তৈরি করেন মাটির মুচি, যাকে দেখতে হয় অনেকটা ডোঙা বা ফানেলের মতো। এটিও খুব ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে নিয়ে মাটির ছাঁচে মোমের নালির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়।

৮) এরপর শুরু হয় ঢালাই করার পালা। ডোকরা শিল্পীরা প্রথমে এক সারি ইট চৌকো করে সাজিয়ে নেন। এতে কাঠ, কয়লা, ঘুঁটে দিয়ে নিজেদের মতো করে ভাটি তৈরি করেন। কেরোসিন দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে মাঝে মাঝে হাতপাখা বা হাপরের সাহায্যে আঁচটি সামান্য বাড়িয়ে নিতে থাকেন। আগুন একেবারে গনগনে হয়ে ওঠার আগে পিতলভর্তি মুচির গোল বলের মতো অংশটি কয়লার ওপর এমনভাবে রাখা হয় যাতে তার ছিদ্রমুখটি ওপরে থাকে এবং মোমভরা মাটির ছাঁচগুলি থাকে ভাটির বাইরের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে মোম পুড়ে গিয়ে থাকে ফাঁকা ছাঁচ।